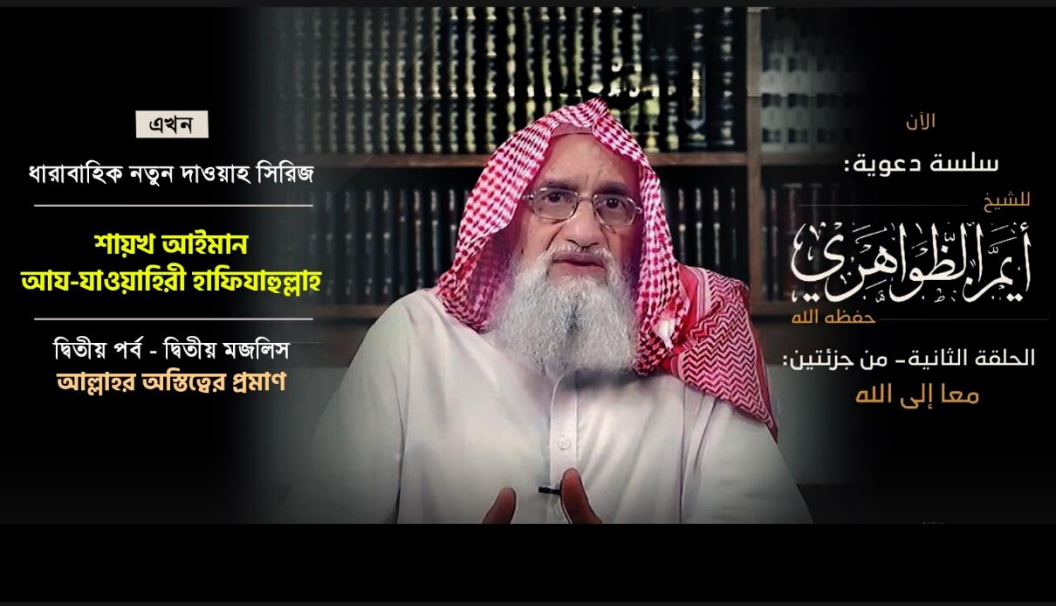

النصر
AN-NASR

ধারাবাহিক নতুন দাওয়াহ সিরিজ

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ

দ্বিতীয় পর্ব - দ্বিতীয় মজলিস

শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা

AN-NASR

-মূল প্রকাশনা সম্পর্কিত কিছু তথ্য-

মূল নাম:

سلسلة دعوية: بعنوان معا إلى الله الحلقة الثانية –من جزئتين

ভিডিও দৈর্ঘ্য: ২৬:২৮ মিনিট
প্রকাশের তারিখ: ১৪৪১ হিজরি, ২০২০ ঈসায়ী।
প্রকাশক: আস সাহাব মিডিয়া

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

দ্বিতীয় পর্ব - দ্বিতীয় মজলিস

بسم الله و الحمد لله و السلام علي رسول الله و أله و صحبه و من والاه

বিসমিল্লাহ...। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবী এবং তাঁর অনুসারীদের উপর।

বিশ্বের আনাচে কানাচে অবস্থানরত আমার মুসলিম ভাইয়েরা!

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বস্তুবাদী নাস্তিকতার দ্বিতীয় অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে, নৈতিক আপেক্ষিকতা। তাদের মতে - নৈতিকতা বা মূল্যবোধ হল পরিবর্তনশীল এবং আপেক্ষিক। প্রত্যেক নীতি বা মূল্যবোধ পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তন হয়। যথাযথভাবে বললে, মূল্যবোধের পরিবর্তনের ব্যাপারটি হল একটি ফলাফল মাত্র।

নৈতিক আপেক্ষিকতার এই দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা সভ্যতায় প্রকটভাবে বিদ্যমান। এই দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় অন্য জাতিসত্তার সাথে তাদের আচরণ থেকে। ভিন্ন জাতিসত্তাগুলোকে ধ্বংস করে তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করাকে তারা কোন অপরাধ মনে করে না। এটাকে তারা একটি যুক্তিযুক্ত কাজ হিসেবে দেখে এবং সভ্যতা বিরোধী কাজ বলে মনে করে না।

এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই প্রতিবন্ধী, অক্ষম, যাযাবর এবং ইহুদি নিধনে জার্মানির নাৎসীবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ সমর্থন পেয়েছিল। কেননা একমাত্র বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এটা জার্মান জাতির জন্য লাভজনক ছিল।

সমীক্ষা:

নাৎসি জার্মানিরা ব্যাপক পরিসরে একটি গণহত্যার প্রচারণা প্রত্যক্ষ করেছিল। যেখানে জার্মানির এবং অন্যান্য অক্ষ দেশসমূহের ছোট বড় সকল অনারোগ্য রোগী, প্রতিবন্ধী এবং অচল ব্যক্তিরা এ হত্যাকাণ্ডের টার্গেটে পরিণত হয়েছিল। এই নিধনযজ্ঞের গোপন নির্দেশনাগুলো প্রদান করেছিল জার্মানির নাৎসিবাদী চ্যান্সেলর এডলফ হিটলার।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে একটি প্রেসিডেন্সিয়াল আইন দ্বারা এই প্রচারণাকে বৈধতা দেয়া হয়। সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যাপার হচ্ছে, এই জঘন্য অপরাধটি সম্পাদনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল একদল ডাক্তারদের যাদের দায়িত্ব ছিলো অসুস্থদের চিকিৎসা দিয়ে প্রাণ রক্ষা করা। এই হত্যাযজ্ঞের পিছনে তারা যে অজুহাত সামনে এনেছিলো তা মূল অপরাধের চেয়েও জঘন্য। এই লক্ষ লক্ষ দুর্বল মানুষগুলোকে হত্যা করা হয়েছিলো শুধু এই অজুহাতে যে একদিকে তারা উৎপাদনে যেমন অক্ষম অপরদিকে তারা রাষ্ট্রের মূল্যবান সম্পদ ভক্ষণ করছে, যা যুদ্ধচলাকালীন সময় রাষ্ট্রের অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঐতিহাসিক মাইকেল ট্রেজেনজারের (Michael Tregenza) বিবৃতি:

১৯৩৫ সাল থেকে হিটলার যুদ্ধনীতি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের হত্যার অজুহাত খুঁজে আসছিল। দুটি ইস্যু সমান্তরালে চলেছে। এই নীতিগুলোর অজুহাত ছিলো, প্রতিবন্ধীরা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানাদি থেকে যথেষ্ট সুবিধা ভোগ করছিলো। অথচ এই সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারত জার্মানির আহত সৈন্যরা। সেই সাথে প্রতিবন্ধীরা রাষ্ট্রের প্রচুর অর্থ ক্ষয় করে। অতএব, কেন এত অপচয়?

সমীক্ষা:

রাষ্ট্রের এই দুর্বল অংশটাকে সামগ্রিক ভাবে নিধনের পিছনে শুধু অর্থনৈতিক বা সামরিক কারণই মুখ্য ছিল না। বরং এর মূলে ছিল আদর্শিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে পশ্চিমা সমাজ একটি রক্তাক্ত ও বর্বর আচরণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক অপরাধে লিপ্ত হওয়ার ধারণাটি ছিল

ডারউইনের 'সুস্থদের বেঁচে থাকা দুর্বলদের বিনাশ করার' দর্শন। যা একটি উত্তম সমাজের আবির্ভাব ঘটাবে।

ঐতিহাসিক মাইকেল ট্রেজেনজারের (Michael Tregenza) বিবৃতি:

প্রত্যেককে অবশ্যই শারীরিক ও মানসিকভাবে দক্ষ হতে হবে। অসুস্থদের কোন স্থান নেই। এটা কোন নাৎসীবাদী চিন্তাধারা নয়। এটা বর্ণভিত্তিক আদর্শ থেকে গৃহীত। এটি হিটলারের থেকে শুরু হয়নি বরং অনেক আগেই প্রকাশ পেয়েছিল।

১৯২০ সাল থেকে বর্ণভিত্তিক উন্নতির তাত্ত্বিক দর্শনেরও অনেক আগে থেকে দুর্বল বর্ণকে নির্মূলের জন্য ভিত্তি প্রস্তুত করা হয়েছিলো। জার্মান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দায়িত্বশীলরা এই মারাত্মক পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য হিটলারের মতো কারো জন্যই অপেক্ষা করছিল। আর সেটা সম্ভব হয়েছিল - উৎপাদনে অক্ষম ব্যক্তিদেরকে হত্যা করার মাধ্যমে। যদি তুমি কিছু উৎপাদনে সক্ষম না হও বা সমাজকে কিছু দেওয়ার মতো সক্ষমতা না রাখো তবে বেঁচে থাকার অধিকার তোমার নেই।

সমীক্ষা:

পশ্চিমা দর্শন তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিবন্ধীদের নির্মূল এবং বর্ণভিত্তিক নির্মূল শুধু নাৎসি জার্মানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এটা পশ্চিমা সবগুলো দেশেরই বহুল প্রচলিত ধারণা ছিল। সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 'উইনস্টন চার্চিল' তার ডায়েরীতে লিখেন:

"আমরা মতে, দুর্বল এবং মানসিক বিকারগ্রস্ত পশ্চাৎপদ শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান অস্বাভাবিক বৃদ্ধি - শক্তিশালী ও উন্নত বংশগুলোর বিকাশে, অর্থাৎ ইউরোপের সার্বিক বিকাশে সামনের দিনগুলোতে জাতীয় এবং জাতিগত হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হবে। আমি মনে করি অতি দ্রুত এই অযোগ্য লোকদের এবং পরবর্তীতে আরও এমন মানুষ তৈরি হবার পুরো সিস্টেমটাকে বন্ধ করা দরকার, অন্যথায় পুরো ইউরোপ পাগল হয়ে যাবে।"

এই করোনা সঙ্কট এটা আমাদের নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, এই রক্তক্ষয়ী বর্ণবাদী নীতিগুলো এখনও পশ্চিমা রাজনীতিবিদ এবং নেতাদের মনে গেঁথে

আছে। উইনস্টন চার্চিলের উত্তরাধিকারী, বর্তমান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, বরিস জনসন করোনা ভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে 'হার্ড ইমিউনিটি (Herd Immunity) নীতির উপর নির্ভর করেছিলেন, যা পাশ্চাত্য সভ্যতায় ডারউইনের 'দুর্বলদের ধ্বংস করা এবং সুস্থদের বেঁচে থাকার' দার্শনিক তত্ত্বগুলোর আরেকটি পরিবর্তিত রূপ।

বরিস জনসনের বিবৃতি:

"এটা পরিষ্কার যে, করোনা ভাইরাস (COVID-১৯) চলমান। এটা ভবিষ্যৎ নিকটবর্তী মাসগুলোতে পুরো বিশ্বে এবং আমাদের দেশেও ছড়াতে থাকবে। এটা এখন বৈশ্বিক মহামারী। আক্রান্তের সংখ্যা তাৎক্ষণিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। প্রকৃতপক্ষে আক্রান্তের সংখ্যা বর্তমানে অনেক বেশী। সম্ভবত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া সংখ্যার চেয়েও প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশী।

আমার অবশ্যই স্পষ্টবাদী হওয়া উচিত। আমাদের সবার এমনই হওয়া উচিত। এটা এ প্রজন্মের জনস্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে খারাপ সঙ্কট। এ রোগটি অনেক মারাত্মক, এটা আরও ছড়িয়ে পড়বে। আমাকে আপনাদের সাথে এবং সত্যিকারের ব্রিটিশ জনগণের সাথে আরও কঠিন সত্যে অংশীদার হতে হবে। অনেক পরিবার সময়ের আগেই তাদের প্রিয়জনকে হারাবে।

সমীক্ষা:

প্রকৃতপক্ষে এ বক্তব্যে তিনি সর্বাধিক সংখ্যক অক্ষম শ্রেণীকে হত্যার উদ্দেশ্যে মহামারী ছড়াতে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

বরিস জনসনের বিবৃতি:

আমি এখনও সবার সাথে হাত মেলাই। আমি সেই হাসপাতালে গিয়েছি যেখানে করোনার রোগী রয়েছে। আমি সেখানে সবার সাথে হাত মিলিয়েছি। আর আমি হাত মিলাবই, কারণ আমি এটাকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি।

সমীক্ষা:

ট্রাম্পের মতে, আমেরিকার অর্থনীতি পুনরায় চালু হওয়ার ব্যাপারে করোনা হবে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ট্রাম্প হোয়াইট হাউজে ম্যারাথন বিবৃতিতে তার রক্তাক্ত বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কোনো কিছুই গোপন রাখেনি। সে আক্রান্ত রোগীদের সংক্রামক শক্তিনাশক ইনজেকশন দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল!

ট্রাম্পের বিবৃতি:

"আমি দেখছি জীবাণুনাশক এক মিনিটে ভাইরাসটি মেরে ফেলে! তাহলে কি এমন কোন উপায় আছে যে আমরা এই জাতীয় কিছু করতে পারি? ভেতরে ইনজেকশন দিয়ে বা জীবাণুনাশক দিয়ে? কারণ আপনারা দেখছেন যে ভাইরাসটি ফুসফুসকে সংক্রমিত করে অনেক কষ্ট দিয়ে থাকে। তাই এ পদ্ধতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ হবে। করোনা পরীক্ষা করলে আপনাকে আবার ডাক্তারের কাছে ফিরে যেতে হবে। এরচেয়ে এ বিষয়টি (আমার দেয়া পরামর্শটি) আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।

সমীক্ষা:

সুতরাং বস্তুবাদী পশ্চিমা সভ্যতার মতে, মানুষ হলো নোংরা পাত্রের ন্যায়, যা পরিষ্কার করার মাধ্যমে পুনরায় ব্যবহার উপযুক্ত হয়। যখন এর কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়, তখন এটি আবর্জনায় ফেলে দেওয়া হয়।

নিজেদের দুর্বল লোকদের সাথে পশ্চিমাদের আচরণ যদি এমন হয়, তাহলে অন্যান্য জাতির সাথে তাদের আচরণ কেমন হবে?

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ:

একইভাবে, জাপানে পারমানবিক বোমা নিক্ষেপ এবং পাঁচ মিলিয়ন ভিয়েতনামীকে হত্যা করাকে বস্তুবাদী ডারউইনের মতবাদ কোন অপরাধ মনে করে না। এমনকি এই অপরাধগুলোর পূর্বে, আমেরিকায় অ্যাংলোস্যাক্সন প্রটেস্টান্ট কর্তৃক রেড ইন্ডিয়ান আদিবাসীদের নির্মূলীকরণ এবং স্টালিন কর্তৃক তুর্কি খানাতে (যা পরবর্তীতে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অংশ হয়েছে) ইসলামিক জনগণের

নির্মূলকরণও এই বস্তুবাদী মতবাদ কোন অপরাধ হিসেবে গণ্য করে না। এটি উল্লেখ করা উচিত যে, ঐ সময়ে শুধু তাতারদের জনসংখ্যা পুরো রাশিয়ার জনসংখ্যার সমান ছিলো। অথচ আজ এই গণহত্যার ফলাফল হিসেবে, তাতার জনসংখ্যা রাশিয়ার জনসংখ্যার একটি সামান্য অংশ মাত্র।

স্ট্যালিনবাদী শাসন ব্যবস্থা তার শ্রেণীবদ্ধ শত্রুদেরকে নির্মূলীকরণ অব্যাহত রেখেছিল। এমনকি গুলাগ কৃষকদেরও নির্মূল করা হয়েছিল। কারণ কৃষকরা তাদের খামারগুলোকে সামষ্টিক খামারে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দিয়েছিল। তাছাড়া স্ট্যালিনের কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধী বহু সদস্যদেরকেও নির্মূল করা হয়েছিলো। স্ট্যালিনিস্ট যুগের ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা বিশ থেকে পঞ্চাশ মিলিয়ন বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। যার মধ্যে কমপক্ষে বারো মিলিয়ন (বাধ্যতামূলক শ্রম) শিবিরেই মারা গিয়েছিল! প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা এবং চেচনিয়াতেও গণহত্যা ও জাতিগত নির্মূলকরণ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছিল।

অতএব অন্যদের নির্মূলীকরণ বা গণহত্যা হলো ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা সভ্যতার ব্যবহৃত একটি পুরনো অস্ত্র। যারা এই কাজ করে আসছে তারা কেউ কেউ পুরোপুরি নাস্তিক্যবাদকে সমর্থন করে, কেউবা আংশিকভাবে সমর্থন করে।

শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ ২০০৭ এ আমেরিকার জনগণকে উদ্দেশ্য করে এক ভাষণে বলেন:

আমেরিকার জনগণের প্রতি শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ এর বার্তা:

“আমি এই অন্যায্য বিবৃতিটিকে খণ্ডন করছি। হলোকাস্ট (ব্যাপক হত্যাকাণ্ড) সংস্কৃতিটি - তোমাদের সংস্কৃতি, আমাদের নয়। জীবিত প্রাণী পোড়ানো আমাদের ধর্মে নিষিদ্ধ, এমনকি পিঁপড়ার মতো ছোট হলেও। আর মানুষের ক্ষেত্রে তো প্রশ্নই আসেনা!

মধ্য ইউরোপে ইহুদীদেরকে তোমাদের ভাতৃগণই পুড়িয়ে হত্যা করেছিলো। কিন্তু এটি যদি আমাদের দেশের কাছাকাছি কোন দেশে হতো, তাহলে আমাদের কাছে আশ্রয় নিয়ে অধিকাংশ ইহুদি বেঁচে যেতো। আর তার প্রমাণ হলো; স্প্যানিশরা

যখন ১৩৯০ সালে চার্চের মাধ্যমে ইহুদিদের বিচার করা শুরু করেছিল তখন ইহুদিরা কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল?

আমাদের দেশে আশ্রয় ব্যতীত ইহুদিরা কোন নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পায়নি। এ জন্যই মরক্কোতে ইহুদী সম্প্রদায় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সম্প্রদায়। তারা আমাদের কাছে বেঁচে আছে, আমরা তাদেরকে জ্বালিয়ে দেইনি। তবে আমরা জুলুমের উপর ঘুমন্ত জাতি নই। আমরা অপমান ও অসম্মানকে প্রত্যাখ্যান করি এবং অত্যাচারী ও আগ্রাসী লোকদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে থাকি। মুসলমানদের রক্ত কখনো বৃথা যাবে না। যদিও তা কালক্ষেপণ করে হয়, তবু অপেক্ষাকারীদের কাছে তা নিকটেই।

তোমাদের খ্রিস্টান ভাইয়েরা চৌদ্দ শতাব্দী ধরে আমাদের মাঝে বাস করে আসছে। কেবল মিশরেই লক্ষ লক্ষ খ্রিস্টান রয়েছে। আমরা তাদের পুড়িয়ে দেইনি, কখনো পোড়াবোও না।"

ফিলিস্তিনের জনগণকে উচ্ছেদ করা এবং তাদের কয়েক'শ হাজার মানুষকে হত্যা করা পশ্চিমাদের নীতিতে - ন্যায়সঙ্গত।

জাতিসংঘ সনদের আহ্বানগুলো ছিল মানুষের সাম্যের পক্ষে। এগুলো তৈরি করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তিসমূহ। জাতিসংঘের উপর বিশ্বের পাঁচ পরাশক্তির নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের বিষয়টি পশ্চিমাদের কাছে অস্বাভাবিক কিছু মনে হয় না।

মূল্যবোধহীনতার অন্যতম একটি উদাহরণ হচ্ছে - পর্নোগ্রাফি এবং যৌনতার সব ধরণের নৈতিক অবক্ষয়ের অনুমতি ও বৈধতা দেওয়া। এমনকি বর্তমানে 'সমকামিতাকে বৈধকরণ'কে সমাজের উন্নতির লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বেশিরভাগ পশ্চিমাদের মতে যদি এটি সামাজিক উন্নতির লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়।

আব্দুল ওয়াহাব আল মাসরী কমিউনিস্ট পার্টিতে তার সহকর্মীদের মধ্যে এই নৈতিক অধঃপতন এবং সুবিধাবাদ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি তাঁর বই 'মাই ইন্টেলেকচুয়াল জার্নিঃ রুট'স, সিড'স অ্যান্ড দ্যা ফ্রুট'স' (My Intellectual

Journey: Roots, Seeds and the Fruits) এর পৃষ্ঠা: ১৩৪ ও ১৩৫ তে বলেন:

"আমি লক্ষ্য করতে শুরু করেছিলাম যে, কমরেডদের ব্যক্তিগত আচরণ যে কোনও ধরনের ধর্মীয় বা মানবীয় আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।"

তারপর তিনি আরও যোগ করে বলেন:

"এবং যে নৈতিক স্বাধীনতা তারা নিজেদেরকে দিয়েছিলো তা পরিপূর্ণ ছিল। অর্থাৎ বাস্তবে তারা ডারউইনের নাৎসি চরিত্রের ছিল। তাদের সাথে মার্কসবাদের বা কোন নৈতিক মূল্যবোধের কোনরকম সম্পর্ক ছিল না। বিশেষত তাদের কিছু লোকের মধ্যে যে 'মার্কসবাদ' উদ্ভূত হয়েছিল, তা মূলত একটি শ্রেণীর প্রতি অন্ধ বিদ্বেষ থেকে তৈরি হয়েছিল। এটি পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আদর্শ থেকে হয়নি।

আমি প্রায়শই অনুভব করতাম যে তাদের মধ্যে কিছুলোক তাদের শ্রেণী মর্যাদার কারণে মার্কসবাদী ছিল। আর যদি তাদের সামনে নিজস্ব শ্রেণী থেকে পালিয়ে এসে শোষক ও নিপীড়ক শ্রেণীতে যোগদানের সুযোগ তৈরি হত, তবে তারা বিনা দ্বিধায় তাই করতো এবং মার্কসবাদকে স্থায়ীভাবে ত্যাগ করতো। এসবের কারণেই আমি আমার পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলাম।"

১৩৮তম পৃষ্ঠায় তিনি আরও উল্লেখ করেন:

"যখন আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম, তখন তথাকথিত 'ভ্যানগার্ড সংস্থা' [নাসের সরকার প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়নের অর্থে] গঠন শুরু হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই ভ্যানগার্ড সংস্থার বেশিরভাগ সদস্যেরই সমাজতান্ত্রিক বা জাতীয় কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না। তারা স্বদেশ বিনির্মাণে সহায়তার জন্য নিজ দেশে ফিরে না গিয়ে, বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করাকে পছন্দ করেছিল।"

একজন নাস্তিক যুক্তি দিতে পারে যে, আপনাদের ধার্মিকদের মাঝেও নৈতিকতার অধঃপতন এবং দুর্নীতির কেলেঙ্কারি আছে।

হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। কিন্তু এখানেও পার্থক্য বিদ্যমান। আমাদের ধর্ম তাদের (অপরাধীদের) নিন্দা করে আর তোমাদের মতবাদ তাদেরকে নির্দোষ বলে।

এখন যদি সে বলে: আমি নৈতিকতা মেনে চলি। তাহলে বলতে হবে, তুমি প্রথমেই বিরোধিতা করলে। কারণ বস্তুবাদ বস্তুর বাইরে কোন মূল্যবোধের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। দ্বিতীয়ত, কেউই অস্বীকার করতে পারবে না যে, নাস্তিকরা তাদের মতবাদে কখনোই ধর্মীয় নিয়ম-নীতি অনুসরণ করেনা। তাদের মতবাদ অনুসারে আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় বস্তুগত কাঠামো দ্বারা। এখানেই তাদের দাবি তাদের বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে দাড়ায়।

***

এই নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের তারল্যের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ উদাহরণের মধ্যে রয়েছে; ফিলিস্তিন প্রশ্নে বস্তুবাদীদের অবস্থান।

১- প্রথমত, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার উপর জোর দিতে চাই, যা কোনো নাস্তিকই অস্বীকার করতে পারবে না। সেটি হলো - মিশর এবং মধ্য প্রাচ্যে কমিউনিস্ট দলগুলো ইহুদীরাই প্রতিষ্ঠা করেছে।

সমীক্ষা:

মরক্কোর কমিউনিস্ট পার্টির জন্যও এটা সত্য। তাদের দলঘেষা সংবাদপত্র 'হিযব আল আমালে' এসেছে:

"হ্যাঁ, সোভিয়েত ইউনিয়ন 'ইসরাঈল' রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার অধিকার রাখে। একই সাথে ফিলিস্তিনকেও স্বীকৃতি দিতো যদি এটা জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হতো।"

এতে আরও এসেছে: "সব হিসাব নিকাশ বাদ দিয়ে পরিশেষে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এটা মেনে নিতে হবে যে, ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে অবস্থানরত মিলিয়ন মিলিয়ন ইহুদিদের জন্য জাতিসত্তা হিসেবে একটি নিজস্ব রাষ্ট্র থাকার অধিকার আছে। এটা

অস্বীকার করার অর্থ হবে নিজের জায়গায় সেখানকার জনগণের বসবাসের অধিকারকে অস্বীকার করা"।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ:

এই (কমিউনিস্ট) দলগুলি দুটি ইস্যুতে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যা তাদের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দিয়েছিল।

প্রথমটি হলো: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের বিরুদ্ধে মিত্রদের সমর্থন করা। আর এই মিত্ররা তথা ফ্রান্স ও ব্রিটেন ছিল মুসলিম দেশগুলোতে আক্রমণকারী ও জোরপূর্বক দখলকারী।

তাছাড়া এই ইহুদি-নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট দলগুলো ইসরাঈলের সাথে আরব দেশগুলোর যুদ্ধকে 'আরব পুঁজিবাদের যুদ্ধ' বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর (তাদের মতে) এর বিকল্প হল – সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আরব ও ইসরাঈলীয় শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করা।

এগুলো ঐতিহাসিক কেলেঙ্কারি যা খুব ভালভাবে নথিভুক্ত আছে। আমি এগুলোর বিশদ বিবরণ দেওয়ার কোন প্রয়োজন দেখি না।

২. দ্বিতীয়ত: সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনগুলো (কমিউনিস্ট ও ননকমিউনিস্ট) সকলে-ইসরায়েলের অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিল। যদিও তারা পূর্বে এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

আমার জানা মতে, ফিলিস্তিন ইস্যুটি সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের গোমড় ফাঁস করে দিয়েছে। এরা সকলেই ইসরাঈলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে। তবে তাদের মতে, দ্বন্দ্বটি হল ফিলিস্তিনের বাকি অংশগুলো নিয়ে। আর ফিলিস্তিনকে ধ্বংসকারী এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের প্রধান ছিলো; ফিলিস্তিন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও), যা ইসরাঈলের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য নিজেদের সনদ পরিবর্তন করেছিল।

অতএব ফিলিস্তিন ইস্যু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের দ্বৈত নীতি (এটি এমন একটি নীতি যা অন্যায্যভাবে বিভিন্ন দলের উপর বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়) প্রকাশ করে

দিয়েছিল। তাদের ধর্মবিশ্বাস কোন প্রমাণিত তথ্যকে মানে না এবং সবকিছুকে আপেক্ষিক মনে করে। একারণেই তারা বিভিন্ন বিষয়ে সহজেই তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে যেগুলোকে পূর্বে তারা 'বিশ্বাসঘাতকতা' মনে করতো।

প্রকৃতপক্ষে, অনেক ধর্মনিরপেক্ষবাদী খোলাখুলিভাবে বলেছে যে, তাদের কাছে মূল্যবোধ 'আপেক্ষিক'। তাদের মতে – এমন কোন ধর্ম অনুসরণ করার কোনো প্রয়োজন নেই, যে ধর্মের আছে একটি 'অপরিবর্তনশীল বিশ্বাস'।

কারণ সবকিছু আপেক্ষিক। সবকিছুই বাজারে উঠানো হয় ক্রয় বিক্রয় এবং দর কষাকষির জন্য। আপনার ধর্ম, মান-সম্মান, ইজ্জত, ভূমি, অর্থ-সম্পদ, পরিবার-পরিজন, এমনকি আপনার নিজের সত্তাও একটি আপেক্ষিক বিষয়। সুতরাং বিশ্বাস, সততা, আনুগত্য, নিষ্ঠা, সম্মান, নৈতিকতা এবং ধর্ম- এসবের সুনির্দিষ্ট কোন অর্থ তাদের অভিধানে নেই। বরং সবকিছুই প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, পরিস্থিতি এবং স্বার্থ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

এই আরব ধর্মনিরপেক্ষবাদী পরাজয়বাদের সাথে তুলনা চলে ক্রুসেডার ইহুদিবাদীদের বর্বর ধর্মনিরপেক্ষবাদের ।

ইহুদি ভাষ্যকার:

আমি আপনাদেরকে একজন বন্ধুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই যিনি পশ্চিম তীরের হেবরন থেকে আগত। তার নাম নোয়াম আরনন (No'aam Aarnon)। তিনি অচিরেই আমাদের পূর্বপুরুষের শহরে আমাদেরকে স্বাগত জানাবেন।

দখলদার নোয়াম আরনন:

সমস্ত ইহুদী, সে যে জাতি-গোষ্ঠীরই হোক, অথবা যে দল, দৃষ্টিভঙ্গি বা বর্ণেরই হোক, সবাই তাদের শেকড়ের সাথে সংযোগ অনুভব করে।

আমার বন্ধুরা!

পুরো দেশ এবং বিশ্বে আপনাদের সমস্ত শাখা সমূহে সচেতনতার সাথে এ মিশন চালিয়ে যান। এটি আপনাদের দায়বদ্ধতা, বন্ধন এবং পবিত্র মিশন"।

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ:

ধার্মিক এবং ধর্মনিরপেক্ষবাদী সকল ইহুদী মনে করে জেরুজালেম ইসরাঈলের চিরস্থায়ী রাজধানী এবং ফিলিস্তিনকে তারা ইসরাঈলী ভূমি হিসেবে বিবেচনা করে। তারা সেখানে বসতি নির্মাণ করেই চলেছে এবং ফিলিস্তিনী অভিবাসীদের ফিরে আসার বিষয়টি তারা মেনে নিতে অনিচ্ছুক। অথচ এটি হল ফিলিস্তিনিদের পূর্বপুরুষদের ভূমি। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যকার নাস্তিক এবং আস্তিক ইহুদীরা বিকৃত ওল্ড টেস্টামেন্টের ওপর নির্ভর করছে। অর্থাৎ তাদের নাস্তিক ও আস্তিকরা একই ধর্মীয় বিশ্বাসে একমত হয়েছে।

কেউ কেউ মনে করে যে সেখানে (ইহুদিদের মধ্যে) ধর্মনিরপেক্ষদেরও অস্তিত্ব রয়েছে, যারা একটি জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে জোর দেয়। এই দাবিকারী ব্যক্তিরা দুটি বাস্তবতা ভুলে যায়:

প্রথমত: যে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি এটা বলেছিল সে ইতিমধ্যে ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দিয়েছে। অতএব সে যে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের দাবি করে তা হল ঈসরাইল এবং ফিলিস্তিনের মধ্যে ভূমি বিভক্তিকরণ। যা ফিলিস্তিনের অবশিষ্টাংশ বা ইসরাইল যতটুকুর অনুমতি দেয় ততটুকু নিয়ে গঠিত।

দ্বিতীয় বাস্তবতা যা তারা ভুলে যায়: কিছু ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা বিশ্বাস করে সব কিছুই আপেক্ষিক, সুতরাং তারা আজকে যে বিষয়ে সমর্থন করে আগামীকাল এটির বিরোধী হয়ে যাওয়া তাদের নিকট অসম্ভবের কিছু নয়। কারণ তারা জগতের অস্তিত্বমান বস্তুর বিলীন হওয়ায় বিশ্বাস করে।

ফিলিস্তিন ইস্যুতে ধর্মনিরপেক্ষদের তরল মতবাদ এবং নিম্ন আচরণ সম্পর্কে ড. মাসরী রহিমাহুল্লাহ তাঁর কিতাবের 'মাই ইন্টেলেকচুয়াল জার্নিঃ রুট'স, সিড'স অ্যান্ড দ্যা ফ্রুট'স' (My Intellectual Journey: Roots, Seeds and the Fruits) ২০৪ নং পৃষ্ঠায় বলেন:

"আমি বামপন্থী সহ মিশরীয় সকল দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে 'ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণের' বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে অংশ নিয়েছিলাম। সেখানে তারা মিশরের পরিচয় সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন

করেছিল। তাতে লেখা ছিল, মিসরীয়রা প্রথমে ছিল ফেরাউনী, তারপর কপটিক, তারপর আরব, তারপর আধুনিক!

তাদের এ কথা চলমান আন্দোলনকে সুদৃঢ় করে। বরং মিশরীয়দের এ পরিচয় এমন এক অস্পষ্ট জায়গায় পৌঁছেছে, যার কোন রঙ, স্বাদ বা গন্ধ নেই। যার নাম দেওয়া হয়েছে আধুনিকতাবাদ। আমি ইঙ্গিত দিয়েছিলাম, এই বিস্ময়কর পরিবর্তনগুলো সত্ত্বেও কেন আমরা মধ্য প্রাচ্যের পরিচয়ে রূপান্তর হওয়ার পরিকল্পনা করছি না, যেমনটা জায়নিস্টরা আহ্বান করছে! সব কিছুই কি আপেক্ষিক নয়? সব বিষয়ই কি একই সমান নয়?"

আরব ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের পরাজিত মানসিকতার আরেকটি দিক রয়েছে। সেটা হলো - ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রতি তাদের ব্যাপক উৎসাহ। ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা স্বাভাবিকীকরণের পক্ষে হোক বা বিরুদ্ধে হোক আলোচনা চালিয়ে যাওয়াকে আধুনিক ও প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা বলে মনে করে।

তাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হলেন নাজিব মাহফুজ। এই নাজিব মাহফুজ ইসলাম ও মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার কারণে এবং ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণে উৎসাহ দেওয়ার কারণে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল। এমনকি মিশরের প্রথম ইসরাঈলী রাষ্ট্রদূত মোশি সাসন (Moshi Sassoon) তার মিশরে দূতালি সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থে উল্লেখ করেন, নাজিব মাহফুজ ছিলেন তার অন্যতম বন্ধু যিনি ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণে বিরোধীতাকারীদের সমালোচনা করতেন। সাসন আরও বলেন, তিনি (নাজিব) এসব করত অর্থের প্রয়োজনে।

নাজিব মাহফুজ ছিলেন আরবদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি সরাসরি ইসরাঈলের সাথে শান্তি প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সালের বিপর্যয়ের পর শান্তি প্রতিষ্ঠার আলোচক দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

আর তাওফীক আল হাকিমের ব্যাপারে শুধু এতটুকু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে যে, সে ইসরাঈলে তার বই বিক্রি থেকে অর্থ উপার্জন করেছিল।

সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণকে উৎসাহিত করার প্রবণতা এবং আমেরিকানরা তাদের দিকে যে ছোট ছোট লোভনীয় বস্তু প্রদর্শন করে সেগুলির প্রতি সকল সেক্যুলারপন্থীদের স্পষ্ট প্রতিযোগিতার প্রবণতা বিদ্যমান। তাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা থাকলেও এই এক জায়গায় এরা সবাই এক। যা ড. আল মাসিরী রহিমাহুল্লাহ সহ অনেকেই স্পষ্ট করেছেন।

***

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ:

তাদের মতে, বস্তুবাদের তৃতীয় সহজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে - উত্তর আধুনিকতা বা অযৌক্তিতার দর্শন।

এটি তথাকথিত নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের উত্থানের সাথে সম্পর্কিত একটি দর্শন। এই দর্শনটি তাত্ত্বিক ও মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে নৈতিক আপেক্ষিকতা (Moral Relativity) হল দুর্বল দেশগুলির উপর গণহত্যার জন্য প্রভাবশালী বিশ্বের একটি হাতিয়ার। কিন্তু পরবর্তীতে অহংকারী সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের কার্যকলাপকে সঠিক প্রমাণ করতে নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়ার সিস্টেমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন মতবাদ চালু করে।

তারা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা ও বিস্তৃত বিশ্বায়নের কথা বলছে। যে ব্যবস্থা সীমানা মুছে দেবে, বাঁধা বিপত্তি উঠিয়ে দেবে, বিজ্ঞানকে বিশ্বজনীন করবে, গণতন্ত্র এবং তথাকথিত স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের প্রসার ঘটাবে। এই হঠাৎ মোড় নেওয়ার রহস্য হচ্ছে অহংকারী পশ্চিমারা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে যে পুরনো পদ্ধতিতে স্থায়ী হওয়ার মত সক্ষমতা তাদের নেই। বিশেষত যখন তাদের ব্যয়ের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তৃতীয় বিশ্বে ব্যাপকভাবে তাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী বেড়ে যাচ্ছে। সেই সাথে ইসলামী বিশ্বে মূল্যবোধ ও রীতি হিসেবে জিহাদের উত্থান ঘটছে। ফলে পশ্চিমারা সরাসরি সংঘাতের পরিবর্তে প্রতারণা এবং প্রলোভনের পথে পা বাড়িয়েছে। তবে তারা শীঘ্রই বুঝতে পেরেছে যে, এ পদ্ধতিটি এমন লোকদের জন্য উপযুক্ত নয় যাদের সুসংহত মূল্যবোধ আছে। বিশেষভাবে

মুসলমানদের জন্য নয় যাদের ধর্মে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বান জানানো হয়।

ফলস্বরূপ পশ্চিমারা মুসলমানদের আকিদার জায়গায় টার্গেট করেছে। তারা এমন এমন পরিভাষার উদ্ভব ঘটিয়েছে যেখানে অবশেষে পরিভাষার মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো হ্রাস পেয়েছে।

তাদের পরিকল্পনা হল পুরো বিশ্বকে একক আইন (আন্তর্জাতিক আইন) দ্বারা পরিচালিত করা। আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি, ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে পুরো বিশ্ব একক বাজারে পরিণত হবে। বাণিজ্য এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে থাকবে না কোনো প্রতিবন্ধকতা। এর ফলে দূরত্ব এবং সময় অপচয় কমে যাবে। ব্যক্তি স্বার্থ ছাড়া আর কোন কিছু মুখ্য হবে না। কোন মূল্যবোধের পরোয়া করা হবে না।

এই প্রতারণামূলক পরিকল্পনাটির জন্য একটি তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক ন্যায়সঙ্গতা প্রয়োজন। এর পক্ষে সাফাই গাইতে যেয়ে উত্তর আধুনিকতার কারিগররা এভাবে বলেছে যে - তারা মতাদর্শ ও আধুনিকতার ক্ষেত্রে ইতিহাসের পরবর্তী যুগে প্রবেশ করেছে। এমনকি মানুষও পরবর্তী অবস্থায় প্রবেশ করেছে। মানুষের চিন্তাভাবনা তরলতার একটি অবস্থায় পৌঁছেছে। কোন ধারা বা নীতির সাথে এর কোনো স্থির সম্পর্ক নেই। অতএব, এই অবস্থার চূড়ান্ত কথা হল - সমস্ত মূল্যবোধের ব্যাপারে একটি বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম অস্বীকৃতি ঘোষণা!

আর নতুন সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় (বিশ্বায়নের যুগে) শুধু পশ্চিমাকে নয় বরং পুরো বিশ্বের সবাইকে গ্রাহক হতে হবে। অতএব ব্যক্তিগত উন্নতির আর কোন সুযোগ থাকবে না। বরং পুরো বিশ্ব একটি ফ্যাক্টরি ও সুপার মার্কেটে রূপান্তরিত হবে। মরুভূমি ও গ্রাম পল্লীর দরিদ্র মানুষজন যাদের হ্যামবার্গার বা স্মার্টফোন প্রয়োজন নেই - তাদেরকেও অবশ্যই এই প্লাটফর্মে যথেষ্ট পরিমাণ অবদান রাখতে হবে। অর্থাৎ প্রয়োজন না থাকলেও ভোগ্যপণ্য ক্রয় করতে হবে। তাদেরকেও অবশ্যই মিডিয়ার প্রলোভনের নিকট আজ্ঞাবহ হতে হবে এবং ব্যাংক থেকে জীবনযাত্রার মান উন্নতির নামে ঋণ নিতে হবে। অর্থাৎ দরিদ্র সম্প্রদায়কেও তথাকথিত

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের দোহায় দিয়ে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ছায়ায় অবশ্যই আসতে হবে।

এভাবে দরিদ্ররা 'পণ্য' এর প্রলোভনে আটকা পড়বে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষার পিছনে দৌড়ানো শুরু করবে। এরপর তারা পা ফেলবে ঋণ ফাঁদে। এর ফলে তারা কোনো পুঁজি জমা করতে সক্ষম হবে না। এই পরিস্থিতিতে তারা তাদের অবস্থা থেকে উন্নতির জন্য আরও ঋণ করবে। কিন্তু সেই ঋণ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত পুঁজি তাদের থাকবে না বা তারা জমাও করতে পারবে না। এভাবে তারা ঋণের দুষ্টচক্রে ঘুরপাক খাবে। তারা নিজেদের নিয়ে চিন্তা করা ছাড়া আর কোন কিছুতে মনোযোগ দিতে পারবে না। পরিশেষে তাদের জিহাদের আকাঙ্ক্ষা ক্রমশই লোপ পাবে।

এভাবেই নৈতিক আপেক্ষিকতা এবং কোন স্থির বিশ্বাস না থাকার বিষয়টির প্রকাশ ঘটবে। এটাই হল নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বা উত্তর আধুনিকতার দর্শন।

তাছাড়া, এভাবেই ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা যুক্তির নামে চার্চের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল অতঃপর অযৌক্তিকভাবেই তা সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়েছিল।

পশ্চিমা আধিপত্যের বৃদ্ধি বাধ্যতামূলকভাবে বস্তুবাদীদের স্বীয় ধ্বংসকেই বুঝায়। কারণ বস্তুবাদী দর্শনের মতে, মানুষ তার যুক্তির অনুশীলন থেকে নৈতিক মূল্যবোধ লাভ করে অথবা প্রকৃতি বা পদার্থ থেকে লাভ করে।

আর সময়ের ধারাবাহিকতায় মানুষ আবিষ্কার করে যে, তার বিবেক কোন উৎস ছাড়াই তার চারপাশে আবর্তিত হয় এবং শক্তিকে শাণিত করে। আর প্রকৃতি বা পদার্থ হল লক্ষ্য উদ্দেশ্যহীন একটি বিষয় মাত্র। কারণ এটি কখনোই মূল্যবোধ নির্ধারণে বাস্তব উৎসকে নির্দেশ করে না। আর এভাবেই সভ্যতা বস্তুবাদী যুক্তিবাদ থেকে বস্তুবাদী অযৌক্তিকতায় স্থানান্তর হয়েছে এবং আধুনিকীকরণ ও আধুনিকতা থেকে উত্তর আধুনিকতায় রূপান্তর ঘটেছে। আর নৈতিক আপেক্ষিকতাই হচ্ছে উত্তর-আধুনিকতার মূল উপাদান।

আর এখানে যা কিছু আলোচনা করা হল - এটাকেই উত্তর আধুনিক দার্শনিকরা এই দর্শনের ভিত্তি স্তর বলে মনে করে। তারা কোন ধরণের উৎস ও মাপকাঠির

উপর নির্ভরতা এবং স্থির সামষ্টিক বিশিষ্ট ইনসাফপূর্ণ জগতের পরিচয় ছাড়াই - অদৃশ্য উৎস, ক্ষমতার আধিপত্য এবং পরিণতির প্রভাবকে বিশ্বাস করে।

এখন এ প্রশ্ন আসে যে, তাহলে তারা কী জন্য অর্থহীন আজে বাজে কথা লেখে, যখন তারা জানে যে তারা কখনও কোন ফলাফলে পৌঁছতে পারবে না? কেনই বা তারা আনন্দ বিনোদনে ডুবে থাকছে না? যেহেতু প্রতিটি বস্তুই অর্থহীন এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে। উত্তর হচ্ছে, তাদের দাম্ভিক বুদ্ধিগত সাধনা সত্য বা বাস্তবতার অনুসন্ধান করে না। বরং তারা প্রবৃত্তির লাগামহীন চাহিদায় ডুবে থাকাকে ন্যায্যতা হিসেবে দেখে।

মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন পশ্চিমা বস্তুবাদ আলোচনা সিরিজের এটাই শেষ পর্ব। যেটি ধর্মের অনুপস্থিতিরই ওপর বিদ্যমান।

আল্লাহর অস্তিত্বে অস্বীকারকারী নাস্তিকদের সরল সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়া এ পর্যন্তই শেষ করছি, এখানে কিছু তাত্ত্বিক নিরসতা থাকতে পারে। আল্লাহ চান তো আগামী পর্বে নাস্তিকতা থেকে ইসলামে ফিরে আসা বিখ্যাত লেখকদের উদ্ধৃতি পর্যালোচনা করে আমি এটাকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করবো। আল্লাহ আপনাদের সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

******